অনেক আঁধার পেরিয়ে

মুহাম্মদ জাভেদ কায়সার رحمه الله

শারঈ সম্পাদনা : শাইখ আহমাদুল্লাহ
ভাষা-সম্পাদনা : আসিফ আদনান

সমর্পণ প্রকাশন

পৃথিবীর পথে পথে

১.

১৯৯০ সালের ৩০ শে এপ্রিল ভোর পাঁচটা দশ মিনিটে বাবা মারা গেলেন।

ওই সময়টা থেকে সকাল নয়টা পর্যন্ত সময়টার কোনো স্মৃতিই আমার মনে নেই। কোথায় ছিলাম তখন, মা কী করছিলেন, তিথি কার কাছে ছিল—অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারি না আমি। শুধু মনে আছে—প্রচণ্ড খিদে লেগেছিল আমার। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝেছিলাম সকাল নয়টা বাজে। স্মৃতির শুরু সেই দেয়াল ঘড়ির সময় দেখেই।

সরকারি কলোনির মানুষদের নিজেদের মধ্যে দারুণ আন্তরিকতা থাকে। প্রত্যেকটা পরিবারের সাথে প্রত্যেকটা পরিবারের নাড়ির টান। মাসজিদের মাইকের শব্দ কানে এল, বাবার মৃত্যুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে। "বি-৬৪/এফ-৯ নিবাসী মুহাম্মাদ নুরুজ্জামান সাহেব আজ ভোরে ইন্তেকাল করেছেন"—এই কথা ছড়িয়ে পড়তে তাই খুব বেশি সময় লাগেনি। স্রোতের মতো মানুষজন আসতে শুরু করল একটা সময়ে।

পুরো বাসা ভর্তি কলোনির মানুষ গিজগিজ করছে। অনেকেই কোলে তুলে নিচ্ছেন আমাকে, তিথিকে। মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার কথাও বলছিলেন অনেকে। খেলার সাথি বন্ধুরা কেমন করে যেন তাকাচ্ছিল আমার দিকে।

বাবাকে বড়ো রুমের ফ্লোরে একটা পাটিতে শুইয়ে রাখা হয়েছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা তাকে। মাথার নিচে বালিশ ছাড়া শুয়ে-থাকা বাবার পাশে আমাদের দুই ভাই-বোনকে বসিয়ে দিয়ে গেলেন কেউ একজন। সামনের বিল্ডিংয়ের আনোয়ার ভাই কোথা থেকে এসে চাদর সরিয়ে বাবাকে দেখালেন

আমাদের। রাতে শোয়ার সময়ে পরা সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে তার। বাবার মুখে এক চিলতে হাসি লেগে ছিল! এই বিষয়টি নিয়ে সবাই খুব কথা বলেছিলেন সেদিন। নুরুজ্জামান সাহেবের মৃত্যু খুব কম কষ্টে হয়েছে, আল্লাহ তার ওপর প্রসন্ন, মুখে হাসি দেখেই মনে হচ্ছে আল্লাহর পছন্দের মানুষ ছিলেন তিনি—এই জাতীয় বিস্তর কথাবার্তা চলছিল। স্পষ্ট মনে আছে আমার।

তিথিকে রেখে খিদে পেটে উঠে গেলাম একসময়ে। বুঝতে পারছিলাম ঠিক—আমাদের ঘোর দুর্দিন আজ। কিন্তু এমন ঘোর দুর্দিনেও যে কারও খিদে লাগতে পারে—এটা সেদিন বুঝেছিলাম প্রথম। কাউকে খিদের কথা কিছু বলতেও ইচ্ছে করছিল না। "খিদে-লাগা-জনিত-অপরাধবোধ" মনে নিয়ে ঘরময় হেঁটে বেড়াতে লাগলাম। এই অপরাধবোধ থেকে আমাকে মুক্তি দিলেন নিচতলার ফয়সাল ভাইয়ার মা। আমাকে রীতিমতো টেনে নিয়ে গেলেন তাদের বাসায়। একটা গোটা ডিম ভেজে দিয়েছিলেন তিনি নাস্তায়। চেয়ারে বসিয়ে খালাম্মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ফিসফিস করে বললেন, "নাস্তা খাও বাবা। সকাল দশটা বেজে গেছে। এতক্ষণ খালি পেটে থাকতে হয় না।"

কেন জানি চোখ ভেঙে কান্না পেল। বাবাকে নিজেদের বাসার ফ্লোরে শুইয়ে রেখে ঠিক তার নিচতলায় একটা গোটা ডিম ভাজি দিয়ে নাস্তা করার অপরাধবোধ থেকে কি?

জানা হয়নি আমার আজও!

শেষ রাতে বাবা'র বুকে ব্যথা অনুভব করা থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমরা সময় পেয়েছিলাম মাত্র ৩৫ মিনিট। একটা ছোটোখাটো 'গোছানো সংসার' আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় পুরোপুরি পাল্টে গিয়েছিল মাত্র ৩৫ মিনিটে।

লক্ষ-কোটি পরিবার আছে এই পৃথিবীতে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় যাঁদের ক্ষেত্রে সময়টুকু এরচেয়েও অনেক কম ছিল। অথচ আমরা কত দূর ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনায় ব্যস্ত, মগ্ন!

দীর্ঘমেয়াদী (জাগতিক) কিছু পরিকল্পনা করতে গেলেই জীবন-থেকে-নেওয়া সেই ভোরের শিক্ষার কথা মনে হয় আমার বারবার—"মাত্র ৩৫ মিনিট"! আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন!

২.

বাবা মারা গিয়েছিলেন রমাদানের ঈদের ঠিক তিন দিন পর। সেবারই শেষবারের মতো বাবার হাত ধরে মার্কেটে গিয়ে ঈদের জামা কেনার আনন্দময় স্মৃতি। কী তুমুল উৎসাহে বাবার সাথে দোকানে যেতাম—ভাবলেই ভীষণ অবাক লাগে এখন!

কুরবানির ঈদের গরুর জন্য আমার প্রগাঢ় মমতা কাজ করত ছোটোবেলায়। অতি পছন্দের গরু জবাইয়ের পরে সারা দিন মন খারাপ থাকত আমার। বাবা মারা গিয়ে এই কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দিলেন আমাকে! ৯০ সালের কুরবানির ঈদে আমাদের কুরবানি দেওয়ার সামর্থ্য হলো না। সেই প্রথম বাবাহীন ঈদের মর্ম টের পাওয়া। খেলার সাথি সবাই যখন নিজেদের গরুকে ভূষি-খড় খাওয়াতে দারুণ ব্যস্ত, আমার তখন অখণ্ড অবসর। মতিঝিল এজিবি কলোনির বি-৬৪, এফ/৯ এর ফ্ল্যাটের বারান্দায় আমার তখন অলস বিকেল কাটছে।

দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। ১৯৯১ সালের রমাদানের ঈদ। ছোটোবেলা দেখেই হয়তো, ঈদে জামা-কাপড় কেনাকে ধর্মীয় নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ভাবতাম। বাবা বেঁচে নেই, তাই নতুন কাপড় কেনা হবে না, সংগত কারণেই আমাদের এবার ঈদ হবে না—এই কথা চিন্তা করে দিনমান চাপা-কষ্ট বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বন্ধুরা সবাই বাবা-মা'র হাত ধরে মার্কেটে যাচ্ছে। ছোটো বোনটিকে সাথে নিয়ে বারান্দার রেলিঙের ফাঁক দিয়ে তাদের আসা-যাওয়া দেখি আমি।

ঈদের দুদিন আগের বিকেলবেলা। নতুন কাপড়ের অভাবে তখন ঈদ না হওয়ার বিষয়ে ৯৮ শতাংশ নিশ্চিত আমি। বাকি ২ শতাংশে 'মধুর বাগড়া' দিলেন আমার মেঝো মামা। ঈদ নষ্ট হতে দিলেন না তিনি। আমাকে সাথে নিয়ে বের হলেন। মেঝো মামা তখন নতুন বিয়ে করেছেন মাত্র। খুব বেশি যে সচ্ছল ছিলেন না তিনি—সেটুকু ঠিক বুঝতে পারতাম। সেই অবস্থাতেও আমাকে নিয়ে গিয়ে চকোলেট কালারের একটি সুন্দর ফুলপ্যান্ট কিনে দিলেন। দীর্ঘ এই জীবনে সেই মাপের খুশি খুব বেশি হয়েছি বলে মনে পড়ে না আমার। সামান্য একটি ফুলপ্যান্টের অসামান্য স্পর্শে প্রবল আনন্দে কাটল আমার সে ঈদ!

তারপরের অনেক ক'টি বছর সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম সেই প্যান্টটিকে। এর মাঝে আরও অনেক প্যান্ট কেনা হলেও চকোলেট কালারের সেই ফুলপ্যান্ট-এর স্থান নিতে পারেনি কোনোটিই। খেলতে গিয়ে একবার হাঁটুর ওপরে ছিঁড়ে গেল। দোকানে গিয়ে তালি মেরে নিলাম। তালি-মারা সেই প্যান্টেই যাবতীয় আনন্দ আমার! কোথাও

কোনো অনুষ্ঠানে যাবে হয়তো সবাই। ভালো প্যান্ট থাকতেও মহানন্দে হাঁটুর ওপরে তালি-মারা চকোলেট কালারের প্যান্ট পরে বাসার সবার আগে আমি রেডি।

আহা! বড়ো মায়ায় জড়িয়ে গিয়েছিলাম আমার চকোলেট কালারের ফুলপ্যান্টটির সাথে।

পুনশ্চ : ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে, বাসা পরিবর্তন করার সময় চকোলেট কালারের সেই ফুলপ্যান্টটি হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি!

৩.

তীব্র রোদের মধ্যে হনহন করে হাঁটছে ছেলেটি। গন্তব্য ওয়ারি।

টিউশনি আছে দুপুর তিনটায়। পৌনে তিনটার মধ্যে পৌঁছতেই হবে। যেই স্টুডেন্টকে পড়ায় ছেলেটি—তার মা অতি ভয়ংকর প্রকৃতির। ভয়ংকর প্রকৃতির না হলে নেহায়েত দুপুর তিনটার সময় পড়ানোর কথা বলতেন না।

দুপুর তিনটা একটা অদ্ভুত সময়। এই সময়ে ভাত না খেয়ে কারও বাসায় যাওয়াটা রীতিমতো অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। উপায় ছিল না ছেলেটির। কলেজ শেষ করে বাসায় ভাত খেয়ে টিউশনিতে গেলে দুপুর তিনটা পার হয়ে যায়। গত মাসে বাসায় ভাত খেতে টিউশনিতে আসতে আসতে চার দিন লেট। মাসের শেষে হিসেব করে চার দিনের বেতন কেটে নিলেন সেই মহিলা! যৎসামান্য টাকার ভেতরে সেই চার দিনের বেতনও অনেক কিছু।

একরকম বাধ্য হয়েই দুপুরে না খেয়ে টিউশনিতে চলে যেতে হতো তাকে। স্টুডেন্টের বাসায় পৌঁছাল যখন সে—ঘড়িতে বিকাল তিনটা দুই মিনিট। শান্তির নিশ্বাস ফেলে কলিংবেল টিপতে গিয়ে থেমে গেল ছেলেটি। দরজায় বিশাল তালা ঝুলছে। নিশ্চয়ই বাইরে কোথাও বেড়াতে চলে গেছেন তারা। এটা নতুন কিছু না। এর আগেও বেশ কয়দিন এসে ফিরে যেতে হয়েছে তাকে। কষ্টের বিষয় হলো—আজকের দিনেও তাকে লেট হিসেবে ধরা হবে! যদিও সে প্রায় নিশ্চিত—তিনটা বাজার আগেই বের হয়ে গেছেন তারা।

ক্লান্ত পায়ে রাস্তায় নামল ছেলেটি। বাইরে প্রচণ্ড গরম। এদিকে সকালের নাস্তা ছাড়া পেটে কিছু পড়েনি। খিদের আগুন জ্বলছে পেটে। অন্যান্য দিন এতটা ক্লান্ত লাগে না তার। কিন্তু আজ পা দুটো যেন চলছে না আর। পাশের 'বিসমিল্লাহ কনফেকশনারি'

নামের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। পকেটে যেই টাকা আছে, তাতে একটা ঠান্ডা ড্রিংকস মিলবে না। তারপরেও সাহস করে একটা ড্রিংকস চাইল সে। কী মনে হতে দোকানদারকে টাকার অভাবের কথাটিও বলে ফেলল।

মাঝ বয়সের দোকানদার স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস করল না ঘামে-নেয়ে-ওঠা ছেলেটিকে। বাকিতে একটা ঠান্ডা ড্রিংকস কপালে জুটল না তার। তীব্র কষ্ট আর অভিমান বুকে করে রাস্তার দিকে পা বাড়াতেই অন্ধকার হয়ে আসল ছেলেটির চারিপাশ। দীর্ঘ সময়ের খালি পেট, তীব্র গরমে অনেকক্ষণ হাঁটা, টাকার অভাবে একটা ঠান্ডা ড্রিংকস না খেতে পারার কষ্ট—এত কিছুর ভার তার ছোট্ট শরীর বয়ে নিতে পারল না আর। দোকানের সামনেই জ্ঞান হারাল ছেলেটি...

১৮ বছর পরে সেই ছেলেটি আজকে এসি রুমের ভেতর বসে রকিং চেয়ারে দোল খেতে খেতে একটানে এই স্ট্যাটাসটি লিখে ফেলল।

জীবন এখন অনেক আনন্দময় তার। আল-হামদুলিল্লাহ! বাসায়-অফিসে-গাড়িতে এসির ভেতর সময় কাটে। গরম-ঠান্ডা যে-কোনো সময়েই ইচ্ছে করলে বরফের-কুঁচি-দেওয়া হিমশীতল পানি খেতে পারে সে। শুধু সেই পানিতে চুমুক দিলেই ১৮ বছর আগের এক তপ্ত দুপুরের জ্ঞান হারানোর নিদারুণ স্মৃতি মনে পড়ে যায় তার।...

আমার ফ্রেন্ডলিষ্ট-ফলোয়ারদের মাঝে অনেকের জীবনের ভয়ংকর কষ্টের কাহিনি জানি আমি। সেই কষ্টগুলো সবার সাথে ভাগাভাগি করে নেওয়ার উপায়ও নেই কোনো। পৃথিবীর পথে পথে বারবার মুখোমুখি হন জীবন সংগ্রামের নানান রঙের তীব্র, একান্ত কষ্টগুলোর। মাঝে মাঝে অতি আপনজন ভেবে আমার সাথে শেয়ার করেন সেই কষ্টের অণু পরিমাণ অংশ। আমি সাহস কিংবা আশার কথা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না তাদের জন্য। আমার এই লেখাটি শুধু আপনাদের জন্য।

কষ্টের দিন পেছনে ফেলে এসে যেই আনন্দের দেখা আপনারা পাবেন—তার স্বাদ অসম্ভব মধুর। দয়া করে হাল ছেড়ে দেবেন না। কষ্টের এই সমুদ্র পেরিয়ে যাবেন আপনারা একটা সময়—ইন শা আল্লাহ।

অন্ধকার যত গভীর হয়, ভোর ততই কাছে চলে আসে।

"অতএব কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।

নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।"[১]

[১] সূরা আল-ইনশিরাহ, ৯৪ : ৫-৬

সুখের সংজ্ঞা

এক আত্মীয়কে নিয়ে ডাক্তারের কাছে এসেছি। ক্যান্সারের ডাক্তার। বিরাট পসার ডাক্তার সাহেবের, পানির মতো রোগী আসছে। যত রোগী আসছেন—সেই অনুপাতে রোগী বেরোতে দেখছি না। বেরোবার কি অন্য কোনো রাস্তা আছে? থাকতেও পারে, ডিজিটাল চেম্বার এগুলো, হয়তো একদিক দিয়ে রোগী ঢুকে- আরেকদিক দিয়ে বের হয়ে যান। একারণেই হয়তো এত মানুষের ভিড় চোখে লাগছে না।

ডাক্তারের চেম্বার সম্পর্কে আমার একটি ভীতি কাজ করে, আমার মনে হয় লক্ষ লক্ষ জীবাণু মুখ হা করে ঘোরাঘুরি করে ডাক্তারদের চেম্বারে। সুযোগ পেলেই ঢুকে পড়বে শরীরে। জ্বরের জন্য ডাক্তার দেখাতে গিয়ে বাসায় ফিরব বসন্ত রোগের জীবাণু শরীরে নিয়ে। পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখব—জ্বর নেই, কিন্তু গা ভর্তি ছোটো ছোটো বসন্ত।

এই চেম্বারটি সে রকম না, বেশ পরিষ্কার, পরিপাটি করে সাজানো। কিন্তু আমার চেম্বার-জনিত-জীবাণুভীতি গেল না, চুপ করে এক কোনায় গিয়ে জবুথবু হয়ে বসে রইলাম। আত্মীয় ভদ্রলোক সামনের দিকে বসে আছেন, হাতে ট্রেনের টিকিটের মতো একটি কাগজ। ডিসপ্লে বোর্ডে নাম্বার চেঞ্জ হচ্ছে, টিকেট নাম্বার হিসেবে রোগী ভেতরে ঢুকছেন। পাশের সিটে একজন ভদ্রমহিলা বসা, পাশের তরুণী মেয়েটি সম্ভবত তার সাথে এসেছেন। চেম্বারে অতি সুন্দর একটি ওয়াল মাউন্ট টিভি লাগানো, সাউন্ড মিউট করা, অখ্যাত এক বিদেশী চ্যানেলে ছবি দেখাচ্ছে টিভিতে। অতি মনোযোগ দিয়ে বোবা ছবি দেখছে সবাই। ভদ্রমহিলার ডাকে সংবিৎ ফিরল,

- 'আপনি কি রোগী?' ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

- না আন্টি, আমি এক আত্মীয়কে নিয়ে এসেছি।

- 'ও আচ্ছা।' চুপ করে গেলেন তিনি।

নিতান্ত কিছু না বললে অভদ্রতা হয়ে যায়, সেই কারণে কথা চালিয়ে গেলাম আমি,

- আন্টি কি ডাক্তার দেখাতে এসেছেন?

- জি বাবা।

- কী সমস্যা আপনার আন্টি?

তাকে দেখেই খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল।

- হাড়ের ক্যান্সার বাবা, ৩ বার কেমো দেওয়া হয়ে গেছে। বেশি দিন আয়ু নেই আর, খুব তাড়াতাড়ি মরে যাব।

বুক ধ্বক করে উঠল আমার, এত নির্লিপ্ত গলায় নিজের মৃত্যুর কথা আগে কাউকে বলতে শুনিনি।

- কী যে বলেন আন্টি! আপনি অবশ্যই অনেকদিন বাঁচবেন ইন শা আল্লাহ।

কিছুটা অভয় দিতে কিংবা পেতে চাইলাম আমি।

- না বাবা। বাঁচব না। আমার স্বামীকেও আমি আপনার মতো করে বলতাম, তোমার কিছু হবে না, অনেকদিন তুমি আমাদের মাঝে থাকবে। থাকেনি। ফুসফুসের ক্যান্সার হয়েছিল তার। পাঁচ মাস আগে ধুপ করে এক সন্ধ্যায় চলে গেল আমাদের ফেলে।

আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না ভদ্রমহিলার কথা, কী ভয়ংকর কথা! মাত্র পাঁচ মাস আগে স্বামী হারিয়েছেন, এখন নিজেও পরপারে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন! আমি মাথা নিচু করে চোখের পানি লুকাতে লুকাতে জিজ্ঞেস করলাম,

- আপনার ছেলেমেয়েরা আন্টি, তারা কোথায়?

- এই আমার এক মেয়ে, কোনো ছেলে নেই। আমি শিক্ষকতা করি, মা-মেয়ের সংসার।

পাশে বসা তরুণীকে দেখিয়ে বললেন তিনি, তারপরের কথাগুলো বলতে গিয়ে গলা ধরে এল তার।

- আজকে এসেছি মেয়েকে দেখাতে। গত সপ্তাহে খুব পেট ব্যথা ছিল। ডাক্তার সাহেব একগাদা পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন। রিপোর্ট দেখিয়েছিলাম গতকাল। মেয়ের কোলন ক্যান্সার ধরা পড়েছে!

তীব্র বিস্ময় নিয়ে জল-ভরা-চোখে ভদ্রমহিলার দিকে তাকালাম আমি। তিনি সাদা শাড়ির কোনা দিয়ে চোখের পানি মুছলেন। কোলন ক্যান্সারের রোগী, শান্ত চেহারার তরুণীটি শুধু একপলক ফিরে তাকাল আমার দিকে। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

আপাতত মৃত্যু পরোয়ানা চোখে নিয়ে ঘুরে-বেড়ানো মানুষদের চোখের দিকে তাকানোর মতো ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা দেননি আমাকে।

****

আমার নিজের যত জাগতিক দর্শন, তার কারিগর আমার 'মা'। প্রথম কৈশোরে বাবাকে হারানোর পর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মাঝে দিয়ে বড়ো হতে হয়েছ—আমার মা সম্ভবত তা অনেক আগেই অনুমান করেছিলেন। বোধকরি সে কারণেই, বিভিন্ন ভাবে তিনি তাঁর চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা, যুক্তি-উপাত্ত, আমার মাঝে বপন করে দিয়েছেন—কখনও শৈশবে, কৈশোরে কখনও, কখনও-বা যৌবনে। এই মূল্যবোধ নিয়েই এতটুকু পথ পাড়ি দিয়েছি। তার অনেকগুলো দর্শনের মাঝে একটা ছিল—"কখনও কারও সাথে নিজের তুলনা করবে না। আর নিতান্ত যদি করতেই হয়, তবে তোমার নিচের দিকে তাকিয়ে তুলনা করবে।"

সে কারণেই আধপেটা খেয়ে বাসের পেছনের বাম্পারে বাদুর-ঝোলা হয়ে কলেজে গিয়েছি খুশিমনে; যেই ছেলেটা খালি পেটে অতটা দূর হেঁটে কলেজে যেত তার থেকে আমি কত ভালো আছি—এই কথাটা ভেবে। আমি এখনও মনে-প্রাণে সেই দর্শনগুলো বুকে লালন করি।

এই শিক্ষিকা ভদ্রমহিলার কষ্টের সাতকাহন সে কারণেই আমাকে আবার সৃষ্টিকর্তার সামনে নতজানু করে দেয়, তাঁর সামনেই মাথা নত করতে শেখায়, অকৃপণভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে শেখায়।

কত সুখেই-না রেখেছেন আমাদের আল্লাহ তাআলা! আল-হামদুলিল্লাহ।